বজ্রপাতে বাড়ছে প্রাণহানি, প্রয়োজন পর্যাপ্ত সতর্কতা

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

চলছে কালবৈশাখি ঝড়ের মৌসুম। এসময় বাংলাদেশের আবহাওয়া যেমন চরম ভাবাপন্ন থাকে, তেমনি ঈশান কোনে ঘন কালো মেঘের প্রভাব, প্রচন্ড ঝড় আর ঝড় বৃষ্টির সাথে চলে বজ্রপাত। গবেষকদের মতে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৮৪ লাখের বেশি বজ্রপাত হয় যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ নিধন, পরিবেশ দূষণ, প্রযুক্তির অপরিমিত ব্যবহার ইত্যাদি নানাবিধ কারণে দেশে অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ন্যায় বজ্রপাতের সংখ্যা, তীব্রতা ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। গত ২৮ এপ্রিল সোমবার দেশের ০৬ (ছয়) জেলায় বজ্রপাতে ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ১১ মে দেশের পাঁচ জেলায় বজ্রপাত ও ঝড়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরো ১৫ জন। এসব ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরো অনেকে। গত কয়েক দিনে কালবৈশাখি ঝড়ের সাথে বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে আরো অনেক স্থানে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বজ্রপাতে হতাহতের সংখ্যা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় ২০১৬ সালে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বজ্রপাতকে “দুর্যোগ” হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বজ্রপাত পরিস্থিতি ও হতাহতের ঘটনা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে বেসরকারি সংগঠন ডিজাস্টার ফোরাম। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে ২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে দেশে বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ৪ হাজার ১৫৮ জনের। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর ২৯৭ জন বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ২০১১ সালেই মারা গেছে ৩৮১ জন। চলতি বছর ১২ মে এপ্রিল পর্যন্ত বজ্রপাতে ৫১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশে বজ্রপাতে নিহত মোট লোক সংখ্যা ২৩৩৯ জন। এর মধ্যে ২০১৮ সালে ৩৫৯ জন এবং ২০১৯ সালে ১৬৮ জন বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২৩ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ৩৮১ জন ও ২০২৪ সালে ২৮৮ জন। বজ্রপাতে মৃতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই কৃষক। এপ্রিল ও মে মাস সাধারণত ধান কাটার মৌসুম। এসময় কৃষক প্রায় বৃক্ষহীন খোলা প্রান্তরে ধান কাটার কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যুর শিকার হচ্ছেন। বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে হাওর এলাকা বিশেষ করে সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জসহ দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে। তবে দেশের মধ্যাঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মেহেরপুর, নাটোর, ময়মনসিংহ, বগুড়াসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বজ্রপাত ও তাতে প্রাণহানির সংখ্যা কম নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ সময় ভূ-পৃষ্ঠ খুব দ্রুত উত্তপ্ত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। সাধারণত দুপুরের দিকে দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও সমুদ্রপৃষ্ঠ অধিক উত্তপ্ত হয় ও নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়। এসময় দেশের দক্ষিণাঞ্চল হতে অপেক্ষাকৃত হালকা, জলীয় বাষ্পপূর্ণ, ও তপ্ত বায়ু উত্তর দিকে এবং উত্তরাঞ্চল ও হিমালয় পর্বতমালা থেকে আগত ঠান্ডা, ভারী ও শুষ্ক বাতাস দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। নিম্নচাপ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত তপ্ত ও হালকা বায়ুর উত্তরমুখী ও উত্তরাঞ্চলের শীতল ও ভারী বায়ুর দক্ষিণমুখী যাত্রার ফলে এদের মিলনস্থলে ঘন কালো মেঘের সৃষ্টি হয়। এসময় দক্ষিণাঞ্চলের বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প নিয়ে উত্তরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ভারী ও শীতল বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয়। পরস্পর বিপরীতমুখী এই বায়ুর মিশ্রণের ফলে এদের সংযোজনস্থলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে আকাশে ঘনকালো মেঘ সৃষ্টি হয়। পরস্পর বিপরীতমুখী বায়ুর সংঘর্ষ, মিশ্রন, গতিপথ পরিবর্তন, ইত্যাদি জটিল প্রক্রিয়ার ফলে বাতাসে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলন ও বাতাসের তীব্র গতির কারণে মেঘে মেঘে ঘর্ষণ তৈরি ও তাতে উচ্চ বিভবের স্থির তড়িৎ সৃষ্টি হয়। এই স্থির তড়িতের প্রভাবেই ঝড় ও বৃষ্টির সাথে বজ্রপাত ঘটে।

মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে যে স্থির তড়িতের সৃষ্টি হয় তার পজেটিভ চার্জ মেঘের উপরের দিকে ও নেগেটিভ চার্জ মেঘের নীচের অংশে অবস্থান করে। মেঘের নীচের দিকের নেগেটিভ চার্জের আকর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বস্তুসমূহের পজিটিভ চার্জ সম্ভব উচ্চতম স্থানে চলে আসে এবং নিকটস্থ বিদ্যুৎ পরিবাহী বস্তুর শীর্ষ বিন্দুতে সর্বোচ্চ বিভব সৃষ্টি করে। মেঘ হতে নেগেটিভ চার্জ সম্বলিত বজ্র ভূ-পৃষ্ঠ আঘাতের প্রাক্কালে সবচেয়ে উঁচু বস্তুর শীর্ষ বিন্দুতে আহিত চার্জের আকর্ষণে ঐ শীর্ষ বিন্দুটিতে আঘাত করে।

সাধারণভাবে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হলেও সুনির্দিষ্ট স্থান ও সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া বজ্রপাতকে প্রতিহত বা এর প্রতিকারও সম্ভব নয়। তবে শহরাঞ্চলে বাসাবাড়ি ও বহুতল ভবনে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন করে স্বল্প আয়তনের স্থানে বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। বজ্রপাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র পন্থা সতর্কতা অবলম্বন। বজ্রপাতে প্রাণহানি হ্রাসে ২০১৩ সাল থেকে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। তবে এর বেশিরভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ দেশের সড়ক মহাসড়কে তালগাছ রোপণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো ২০১৬ সালে। ধারণা করা হয় যে তালগাছের কান্ড ও পাতা যথেষ্ট মজবুত ও গাছটি যথেষ্ট উঁচু হওয়ার কারণে আশপাশের অন্যান্য স্থাপনার চেয়ে তাল গাছে বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশী ও এর বজ্রাঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অন্য যে কোন গাছের চেয়ে বেশি। এই ধারণা থেকে সরকার সারাদেশে খোলা স্থানে বিশেষ করে রাস্তার দুই পাশে তালগাছ রোপণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তালগাছে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ও এর বজ্রাঘাত সহ্য করার উচ্চ ক্ষমতা শুধু অনুমাননির্ভর ও জনশ্রুতি। এটা কোন গবেষণায় প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া তালগাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত ধীরগতির। এ গাছ পরিপক্ব হতে ৩০/৪০ বছর সময় লেগে যায়। এত দীর্ঘ সময় পর কার্যকরের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা নিতান্তই অনুপযুক্ত একটি সিদ্ধান্ত। তাই পরবর্তীতে সরকার এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে

আসে। পরবর্তীতে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় খোলা মাঠে বজ্রাঘাত সহনশীল আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। কিন্তু দেশের সকল স্থানে এ ধরনের পর্যাপ্ত সংখ্যক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও একটি উচ্চাভিলাসী সিদ্ধান্ত। একারণে সরকার এ সিদ্ধান্ত থেকেও সরে আসে। তবে শহরাঞ্চলে বহুতল ভবনে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করায় সীমিত পরিসরে বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি সামান্য কমানো সম্ভব হয়েছে।

বজ্রপাতের সময় সচেতনতা এবং কিছু জরুরি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই প্রাণহানির ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতর বজ্রপাতের সময় নিরাপদ থাকার জন্য যে ২০টি নির্দেশনা দিয়েছে, তা প্রতিটি নাগরিকের জানা জরুরি। বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং বা পাইপ ছোঁয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। খোলাস্থানে একত্রে অনেক মানুষ থাকলে বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যেতে হবে। বাড়িতে যদি যথেষ্ট নিরাপত্তা না থাকে, তবে সবাই এক জায়গায় না থেকে আলাদা কক্ষে অবস্থান করতে হবে। বড় গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া বিপজ্জনক, তাই গাছ থেকে অন্তত চার মিটার দূরে থাকতে হবে। ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তার বা তারের নিচ দিয়ে চলাচল না করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

বজ্রপাতের সময় সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগ খুলে রাখা উচিত এবং আহত ব্যক্তিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চিকিৎসা দিতে হবে। এপ্রিল থেকে জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়, তাই এই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা দিলে ঘরের ভেতরে অবস্থান করাই নিরাপদ। যত দ্রুত সম্ভব পাকা দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেওয়া উচিত এবং ঘরে থাকলেও জানালার পাশে বা বারান্দায় না দাঁড়িয়ে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে বের হওয়া এবং প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ধাতব খুঁটি বা মোবাইল টাওয়ার থেকে দূরে থাকা উচিত। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ বা উঁচু স্থানে অবস্থান না করাই উত্তম। কালো মেঘ দেখলে নদী, পুকুর, জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা করা থেকে বিরত রাখা উচিত এবং নিজেরাও খোলা মাঠ এড়িয়ে চলা উচিত। খোলা মাঠে থাকলে দুই পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে কানে আঙুল দিয়ে মাথা নীচু করে বসে পড়া নিরাপদ। গাড়িতে থাকলে ধাতব অংশ স্পর্শ না করে কংক্রিট ছাউনির নিচে গাড়ি নিয়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত। একইভাবে, মাছ ধরার সময় বজ্রপাত শুরু হলে নৌকার ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে এবং মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে।এই নির্দেশনাগুলো মেনে চললে বজ্রপাতজনিত দুর্ঘটনা থেকে নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ রাখা সম্ভব। সচেতনতা ও প্রস্তুতিই হতে পারে প্রাণ রক্ষার মূল চাবিকাঠি।

বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। একে প্রতিহত করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি সুনির্দিষ্ট স্থান তারিখ উল্লেখ করে এর পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় সচেতন থাকা। খোলা প্রান্তর যে খানে পর্যাপ্ত গাছপালা নেই ও যেখান থেকে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেখানে যাওয়ার পূর্বে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে নেওয়া এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকলে এখন স্থানে যাত্রা পরিহার করতে হবে। মোটকথা বজ্রের আঘাত থেকে রক্ষা পেতে নিজে সচেতন থাকতে হবে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার